আই.ডি নিয়ে কূট-কচালি

অভিজিৎ রায়

(সিলিকন ভ্যালি থেকে প্রকাশিত মাসিক পড়শীর ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত)

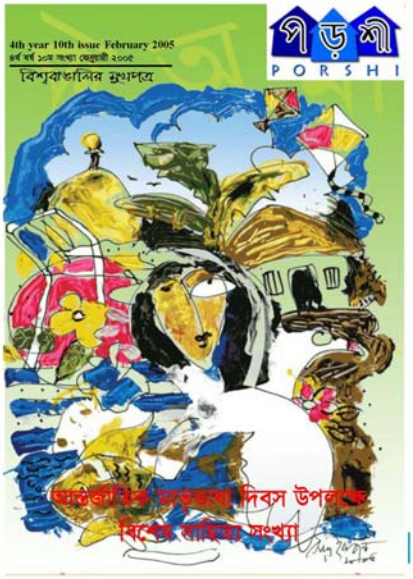

আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী আর শেষ পর্যন্ত প্রাণ কি ভাবে সৃষ্ট হল - এটি বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শন জগতের এক অতি পুরোন প্রশ্ন। বিজ্ঞান তো এর উত্তর খুঁজছেই, সেই সাথে এর একটি দিক নির্দেশনা দিতে চাইছে ধর্মগ্রন্থ গুলো, চাইছে দর্শন শাস্ত্রগুলোও। আর এই সৃষ্টি রহস্য নিয়ে প্রত্যেক জাতির মধ্যে সেই প্রাচীন কাল থেকেই ছড়িয়ে রয়েছে নানা ধরনের কল্প-কাহিনী, ইংরেজীতে যেগুলোকে বলে ‘myth’। যেমন, প্রাচীন চৈনিক একটি কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির শুরুতে একটা কালো ডিমের মত ছিল। প্যান গু নামের একজন দেবতা তাঁর কুড়ালের কোপে ডিমটিকে দ্বিখন্ডিত করেন এবং মহাবিশ্বকে প্রসারিত হবার সুযোগ করে দেন। প্যান গুর শরীরের মাছি আর উকুন থেকেই নাকি পরবর্তীতে মানব সভ্যতার জন্ম হয়েছে। আবার অ্যাপাচি মিথ অনুযায়ী, সৃষ্টির শুরুতে আসলে কিছুই ছিল না - না ছিল এই পৃথিবী, আকাশ কিংবা কোন সূর্য -চন্দ্র-তারা। এই তমসাচ্ছন্ন নিকষ অন্ধকার থেকে হঠাৎ করেই একটি পাতলা চাকতির অভ্যুদয় ঘটে, যেখানে আসীন ছিলেন এক ‘দাঁড়ি ওয়ালা ভদ্রলোক’ - যিনি এ জগতের মালিক, আমাদের বিশ্বপিতা! তিনিই নিজের ইচ্ছায় জগৎ থেকে শুরু করে প্রাণ পর্যন্ত সব কিছুই সৃষ্টি করেন। তাহিতিয়ান (Tahitian) কল্পকাহিনী আবার শুরু হয়েছে তারোয়াকে দিয়ে যিনি অনন্ত এবং চিরন্তন। হঠাৎ করেই একদিন একাকীত্ব অনুভব করতে থাকেন তিনি, আর সেই একাকীত্ব ঘোচানোর জন্যই বোধ হয় তার চারদিকে সবাইকে ডাকাডাকি করতে শুরু করতে লাগলেন। কিন্তু কোন দিক থেকেই কোন প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় তিনি অগত্যা মনের দুঃখে নিজেকেই শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিণত করে ফেলেন। হিন্দু পুরান কিন্তু বলছে, মহাপ্রলয়ের শেষে এই জগৎ যখন অন্ধকারময় ছিল, তখন বিরাট

মহাপুরুষ পরম ব্রহ্ম নিজের তেজে সেই অন্ধকার দূর করে জলের সৃষ্টি করেন, সেই জলে সৃষ্টির বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। তখন ওই বীজ সুবর্ণময় অন্ডে পরিণত হয়। অন্ড মধ্যে ওই বিরাট মহাপুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে অবস্থান নিতে থেকেন। তার পর ওটিকে বিভক্ত করে আকাশ ও ভূমন্ডল আর পরবর্তীতে প্রাণ সৃষ্টি করেন। বাইবেল এবং কোরাণ আবার বলছে, সৃষ্টিকর্তা ছয় দিনে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরী করেছিলেন। এর মধ্যে বাইবেলের (জেনেসিস) ধারণা অনুযায়ী ছয়দিনের প্রথম দিনটিতেই ঈশ্বর আমাদের এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেন। এর চারদিন পর তিনি সূর্য, চন্দ্র আর তারকারাজির সৃষ্টি করেন।

এগুলোতো গেল কল্পকাহিনী আর সাধারণ মানুষজনের প্রাচীন কাল থেকে গড়ে ওঠা নানা ধরণের বিশ্বাস- অপবিশ্বাসের কথা। বিজ্ঞান কিন্তু বিশ্বাস কিংবা কল্পকাহিনী নিয়ে কাজ করে না, বিজ্ঞানের কাজ তথ্য এবং প্রমাণে। সাম্প্রতিক সময়ে জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা আর পর্যবেক্ষণশীল জ্যোতির্বিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি নিখুঁত ভাবে মহাবিশ্বের অনেক জটিল রহস্যের সমাধান আমাদের কাছে খুব সহজভাবে তুলে ধরেছে। শক্তিশালী টেলিস্কোপ আর আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির নিখুঁত সমন্বয়ে সাম্প্রতিক তথ্য এবং উপাত্তকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে; আর এর ফলে বিজ্ঞানীরা এখন মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন, এ মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়েছে প্রায় চৌদ্দশ কোটি (খুব সঠিক ভাবে বললে অবশ্য ১৩.৭ বিলিয়ন) বছর আগে অতি ক্ষুদ্র স্থান-কালের এক অদ্বৈত বিন্দু থেকে - মহাবিস্ফোরনের মধ্য দিয়ে (যাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'বিগ ব্যাং')। তারপর তা ক্রমাগতভাবে প্রসারিত হয়ে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছিয়েছে। বিগ-ব্যাং-এর সাথে এই মহাজাগতিক স্ফীতিকে জুড়ে দিয়ে যে প্রতিরূপ নির্মান করা হয়েছে, তাকেই আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা আদর্শ প্রতিরূপ (standard model) হিসেবে গণ্য করেছেন। আমাদের এ চেনা পরিচিত মহাবিশ্বে শুধু কোটি কোটি গ্রহ, তারা নিহারীকাই রয়েছে তা নয়, সেই সাথে রয়েছে রহস্যময় গুপ্ত পদার্থ (dark matter) এবং গুপ্ত শক্তি (dark enrgy)। আমার লেখা '***আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী*** বইটিতে (অঙ্কুর প্রকাশনী, এ বছরের একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য) এর বিষদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞানেরও কিন্তু সীমাবদ্ধতা আছে। হয়ত সীমাবদ্ধতাটি ঠিক বিজ্ঞানের নয়, সঠিক ভাবে বলতে গেলে এটি কালের সীমাবদ্ধতা। বিজ্ঞান আলাদীনের চেরাগের মত একসাথে সব রহস্যের সমাধান করতে পারে না। বরং বিজ্ঞান এগোয় হাটি হাটি পা পা করে। এক যুগের বিজ্ঞানীরা আলোর মশাল জ্বেলে দেন আর পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানীরা সেই আলোয় বিনির্মাণ করেন আগামীকালের যাত্রাপথ। এক যুগেই সব কিছুর সমাধান দেওয়ার 'টনিক' বিজ্ঞান কখনই আবিষ্কার করেনি, সে দাবীও সে করে না। যুগের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়েই বিজ্ঞান এগোয়। নিউটনের যুগে নিউটনের পক্ষে সম্ভব হয়নি আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুধাবন করার, আবার আইনস্টাইনের পক্ষেও সম্ভব হয়নি আজকের স্ট্রিং তত্ত্বের রহস্য ভেদ করার মত অবস্থায় পৌঁছাবার। এই কালের সীমাবদ্ধতার কারণেই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বিজ্ঞান এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সকল রহস্যের সমাধান দিতে পারে নি। যেমন, বিজ্ঞান এখনও ব্যাখ্যা করতে পারে না মহাবিস্ফোরন বা বিগ-ব্যাং-এর পূর্বের কোন অবস্থাকে, কিংবা বলতে পারে না আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের কারণ। আর যেখানেই বিজ্ঞান নিরব, সেখানেই বোধ হয় শুরু হয় ধর্ম আর দর্শনের আনাগোনা।

সম্প্রতি কিছু দার্শনিকদের পক্ষ থেকে নতুন কিছু যুক্তির অবতারনা করে একটু ভিন্নভাবে মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে । তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় যেটি হল : সৃষ্টির '৬২দ্ধিদীপ্ত অনুকল্প (Intelligent Design argument), সংক্ষেপে আই. ডি । মাইকেল বিহে, উইলিয়াম

ডেম্বস্কি, জর্জ এলিস, ফিলিপ জনসন প্রমুখ এ তত্ত্বটির প্রবক্তা। এঁদের যুক্তি হল, আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড এমন কিছু চলক বা ভ্যারিয়েবলের সূক্ষ্ম সমন্বয়ের (Fine Tuning) সাহায্যে তৈরী হয়েছে যে এর একচুল হের ফের হলে আর আমাদের এ পৃথিবীতে কখনই প্রাণ সৃষ্টি হত না। অর্থাৎ, পরবর্তীতে প্রাণ সৃষ্টি করবেন এই ইচ্ছাটি মাথায় রেখে ঈশ্বর (কিংবা হয়ত অন্য কোন বুদ্ধিমান সত্ত্বা) বিশ্বব্রহ্মান্ড তৈরী করেছিলেন, আর সে জন্যই আমাদের মহাবিশ্বঠিক এরকম; এত নিখুঁত, এত সুসংবদ্ধ। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মহাবিশ্ব সৃষ্টির পাছনে ঈশ্বর জড়িত থাকবার ব্যাপারটা মুখ ফুটে সরাসরি না বললেও সেদিকেই প্রায়শঃ ইঙ্গিত করে বলেন, বৈজ্ঞানিক ডেটা গুলো শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় কিংবা উচিৎ ও নয়, এগুলোকে সঠিকভাবে বোঝা যাবে তখনই, যখন এক সৃজনশীল সজ্ঞাত সত্ত্বার (intelligent agent) সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে এগুলোকে দেখার চেষ্টা এবং বিশ্লেষণ করা হবে। এই 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন' বা সংক্ষেপে 'আই.ডি' ইদানিংকালে কারো কারো কাছে এতটাই গুরুত্ব পেয়েছে যে, তাঁরা অনেকেই এই তত্ত্বটিকে বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত করে স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে চান, এবং এ নিয়ে এক ধরনের আন্দোলনও তারা শুরু করেছেন সারা বিশ্বব্যাপী।

'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প'- ব্যাপারটা একটু ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যাক। ধরা যাক মাধ্যাকর্ষণের কথা। নিউটন তার মাধ্যাকর্ষণ সূত্রে একটি ধ্রুবক ব্যবহার করেছিলেন যাকে আমরা বলি নিউটনীয় ধ্রুবক, বা গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট । নিউটন তার সেই বিখ্যাত সূত্রে দেখিয়েছিলেন, দুটো বস্তুর মধ্যে আকর্ষণবলের পরিমান ঠিক কতটা হবে সেটা নির্ণয়ে এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট নামের রাশিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি ওই ধ্রুবকটির মান এখন যা আছে তা না হয়ে অন্যরকম হত আকর্ষণ বলের পরিমাণও যেত বদলে। সাদা চোখে মনে হবে যে ব্যাপারটা সামান্যই, আকর্ষণ বল বদলালেও বোধ হয় তেমন কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, ওই ধ্রুবকের মান আসলে আমাদের এই পরিচিত বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রকৃতি নির্ধারণ করছে। ওটার মান এখন যা আছে তা না হয়ে যদি অন্য ধরণের কিছু হত তা হলে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডটাই হত অন্যরকম। ওই ধ্রুবকের মান ভিন্ন হলে তারাদের মধ্যে হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হয়ে হিলিয়াম উৎপাদনের মাত্রাকে দিত বদলে। হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের পর্যাপ্ততা শুধু এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট এর উপরই নয়, মহাকর্ষ এবং দুর্বল পারমানবিক বলের মধ্যকার শক্তির ভারসাম্যের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন, তারা দেখিয়েছেন, দুর্বল পারমানবিক বলের শক্তি যদি একটু বেশী হত, এই মহাবিশ্বে পুরোটাই মানে শতকরা একশ ভাগ হাইড্রোজেনে পূর্ণ থাকত, কারণ ডিউটেরিয়াম (এটি হাইড্রোজেনের একটি মাসতুত ভাই, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'আইসোটোপ') আর হিলিয়ামে পরিণত হবার আগেই সমস্ত নিউট্রন নিঃশেষ হয়ে যেত। আবার দুর্বল পারমানবিক বলের শক্তিমত্তা আরেকটু কম হলে সারা মহাবিশ্বে শতকরা একশ ভাগই হত হিলিয়াম। কারণ সে ক্ষেত্রে নিউট্রন নিঃশেষিত না হয়ে তা উৎপন্ন প্রটোনের সাথে যোগ দিয়ে হাইড্রোজেন তৈরীতে বাঁধা দিত। কাজেই এ দু' চরম অবস্থার যে কোন একটি সঠিক হলে মহাবিশ্বে কোন নক্ষত্ররাজি তৈরী হওয়ার মত অবস্থাই কখনও তৈরী হত না, ঘটত না আমাদের এই মলয়শীতলা ধরনীতে কার্বন-ভিত্তিক প্রাণের নান্দনিক বিকাশ। আবার, বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনের ভর মাপতে গিয়ে দেখেছেন তা নিউট্রন-প্রোটনের ভরের পার্থক্যের চেয়ে কিছুটা কম যার ফলে তারা মনে করেন, একটি মুক্ত-নিউট্রন সহজেই প্রোটন, ইলেকট্রন ও অ্যান্টি-নিউট্রিনোতে পরিনত হতে পেরেছে। যদি ইলেকট্রনের ভর সামান্য বেশী হত, নিউট্রন তাহলে সুস্থিত হয়ে যেত, আর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন সমস্ত ইলেকট্রন আর প্রোটন সব একসাথে মিলে-মিশে নিউট্রনে পরিনত হয়ে যেত। এর ফলে যেটা ঘটত সেটা আমাদের জন্য খুব একটা সুখপ্রদ কিছু নয়। সে ক্ষেত্রে খুব কম পরিমানে হাইড্রোজেনই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকত আর তা হলে নক্ষত্রের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানীই হয়ত খুঁজে পাওয়া যেত না। জন ডি. ব্যরো এবং ফ্রাঙ্ক জে. টিপলার এ ধরনের নানা ধরনের রহস্যময় 'যোগাযোগ'

তুলে ধরে একটি বই লিখেছেন ১৯৮৬ সালে, নাম- 'The Anthropic Cosmological Principle'। তাঁদের বক্তব্য হল, আমাদের মহাবিশ্বে গ্র্যাভিটেশনাল অথবা কসমলজিকাল ধ্রুবকগুলোর মান এমন কেন, কিংবা মহাবিশ্বের চেহারাটাই বা এমন কেন হয়েছে তার উত্তর পেতে হলে ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ এবং মানুষের উপস্থিতির দিকে তাকিয়ে। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির জন্য সর্বোপরি মানুষের আবির্ভাবের জন্য এই মৌলিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান ঠিক এমনই হওয়া দরকার ছিল - সে জন্যই ওগুলো ওরকম। দৈবক্রমে ওগুলো ঘটে নি, ররং এর পেছনে এক বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার (বিধাতার) একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। মানুষকে কেন্দ্রে রেখে বিশ্বব্রহ্মান্ডের নিয়ম-নীতিগুলোকে ব্যাখ্যা করবার এই যুক্তিকে বলা হয় 'অ্যানথ্রোপিক আর্গুমেন্ট' বা 'নরত্ববাচক যুক্তি'। গনিতবিদ এবং দার্শনিক ডঃ উইলিয়াম ডেম্বস্কি ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Intelligent Design: The Bridge Between Science & Theology' বইয়ে তথ্য বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, আমাদের এই মহাবিশ্বের ভিতর যে ধরনের বিমূর্ত তথ্য লুকানো আছে তা কোন ভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট হতে পারে না। বায়োরসায়নবিদ ডঃ মাইকেল বিহে তাঁর 'Darwins Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution' (১৯৯৬) বইয়ে 'Irreducible complexity' নামক একটি নতুন শাব্দিক পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন, স্রেফ প্রাকৃতিক নিয়মে সরল অবস্থা হতে জটিল জৈব-অভিব্যক্তির মাধ্যমে আজকের জটিল জীবজগতের সৃষ্টি হতে পারেনা।

এধরনের যুক্তিগুলো প্রথম দৃষ্টিতে খুব আকর্ষনীয় দেখালেও, অনুসন্ধিৎসু সংশয়বাদী চোখ দিয়ে দেখলে কিন্তু নানা দুর্বলতা প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ ব্যারো এবং টিপালার যে যুক্তি দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে এটি ধরেই নেওয়া হয়েছে আমাদের পৃথিবীতে যে ভাবে কার্বন ভিত্তিক প্রাণের বিকাশ ঘটেছে সেভাবে ছাড়া আর অন্য কোনভাবে প্রাণ সৃষ্ট হতে পারবে না। এই সজ্ঞাত ধারণাটি কখনই সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। যেমন, বিজ্ঞানীরা কিন্তু কার্বনের পাশাপাশি সিলিকন ভিত্তিক প্রাণের বিকাশকেও ইদানিং কালে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। প্রকৃতিতে পাওয়া ডায়াটম গুলো (জীববিজ্ঞানের ভাষায় এগুলো এক ধরনের eukaryotic algae) এমনি একটি উদাহরণ। এছাড়াও আমাদের কম্পিউটারে, রবোটে সিলিকন ভিত্তিক চিপের ব্যাপক ব্যবহার কার্বন ভিত্তিক প্রাণের পাশাপাশি আগামীর পৃথিবীতে সিলিকনভিত্তিক কৃত্রিম প্রাণের বিকাশের গুরুত্বকেও স্পষ্ট করে তোলে। আবার আমরা প্রায়শঃই শুনি যে, আমাদের পৃথিবীতে তাপ, চাপ সবকিছু যদি সঠিক অনুপাতে না থাকত, তবে নাকি প্রাণের বিকাশ ঘটত না। এই যে পৃথিবীটা ২৩.৫ ডিগ্রীতে হেলে আছে, তার এক চুল এদিক ওদিক হলে তাপ আর চাপের এমন বৈষম্য তৈরী হত যে, প্রাণ সৃষ্টিই অসম্ভব একটি ব্যাপারে পরিণত হত। কিন্তু অনেকেই প্রাণের এই ধরনের 'সঙ্কীর্ণ' সংজ্ঞার সাথে একমত পোষণ করেন না। তারা বলেন, আমরা ওই ধরণের 'সর্বোত্তম' পরিবেশে বিকশিত হয়েছি বলে আমরা মনে করি প্রাণের উৎপত্তির জন্য ঠিক ওধরণের পরিবেশই লাগবে। যেমন, বাতাসে সঠিক অনুপাতে অক্সিজেন, চাপ, তাপ ইত্যাদি। এগুলো ঠিক ঠিক অনুপাতে না থাকলে নাকি জীবনের বিকাশ ঘটবে না। এটি একটি সজ্ঞাত ধারণা, প্রামাণিত সত্য নয়। অক্সিজেনকে জীবন বিকাশের অন্যতম উপাদান বলে মনে করা হয়, কিন্তু মাটির নীচে এমন অনেক ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের জন্য অক্সিজেন শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, রীতিমত ক্ষতিকর। সমুদ্রের গভীর তলদেশে এমনকি কেরসিন তেলের ভিতরের বৈরী পরিবেশেও প্রাণের বিকাশ ঘটেছে এমন প্রমাণ বিজ্ঞানীদের কাছে আছে - যে পরিবেশের সাথে আসলে আমাদের সংজ্ঞায়িত 'সর্বোত্তম পরিবেশের' কোনই মিল নেই। কাজেই হলফ করে বলা যায় না যে, মহাজাগতিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান অন্যরকম হলে এই মহাবিশ্বে প্রাণের বিকাশ ঘটত না। বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ অধ্যাপক ভিকটর স্টেংগর তার 'The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology' বইয়ে দেখিয়েছেন

চলক আর ধ্রুবকগুলোর মান পরিবর্তন করে আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ডের মতই অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মান্ড তৈরী করা যায়, যেখানে প্রাণের উদ্ভবের মত পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। এর জন্য কোন সুক্ষ্ম সমন্বয় বা 'ফাইন টিউনিং' এর কোন প্রয়োজন নেই। এই ব্যাপারটি বোঝানোর জন্য তিনি 'মাঙ্কি গড' নামের একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখেছেন যার প্যারামিটারগুলোতে নির্বিচারে মান বসিয়ে সেই তথাকথিত 'অ্যানথ্রোপিক কোইন্সিডেন্স' ঘটানো যায়, ঈশ্বরের বা অন্য কোন সজ্ঞাত সত্তার হাত ছাড়াই। 'মাঙ্কি গড' শুনতে খেলো শোনালেও এটি কোন ছেলে খেলা নয়, বরং প্রখ্যাত যুক্তিবাদী এবং স্যেকুলার ওয়েবের প্রধান সম্পাদক রিচার্ড ক্যারিয়ারের ভাষায়, একটি 'সিরিয়াস রিসার্চ প্রোডাক্ট' যা *Philo*, 3:2 (Fall-Winter 2000) জার্নালে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়েছে। আমি নিজেও ডঃ স্টেংগরের এই প্রোগ্রামটি তাঁর ওয়েবসাইট থেকে বহুবার ব্যবহার করেছি। কাজেই ডঃ স্টেংগর যখন বলেন, 'Fine Tuners have no basis in current knowledge for assuming that life is impossible except for a very narrow, improbable range of parameters' তখন সেটিকে গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের উপায় থাকে না।

'ফাইন টিউনিং' আর্গুমেনটের এর সমালোচনা করেছেন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েইনবার্গও। তিনি 'A Designer Universe?' প্রবন্ধে এ ধরনের যুক্তির সমালোচনা করে বলেন :

> *'কোন কোন পদার্থবিদ আছেন যারা বলেন প্রকৃতির কিছু ধ্রুবকের মানগুলোর এমন কিছু মানের সাথে খুব রহস্যময়ভাবে সূক্ষ-সমন্বয় (fine-tune) ঘটেছে যেগুলো জীবন গঠনের সম্ভাব্যতা প্রদান করে। এ ভাবে একজন মানব দরদী সৃষ্টিকর্তাকে কল্পণা করে বিজ্ঞানের সব রহস্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। আমি এই ধরনের সুক্ষ্ম-সমন্বয়ের ধারণায় মোটেও সন্তুষ্ট নই।'*

সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পটি শুধু জ্যোতির্বিদ্যায় নয়, খুব উচ্ছ্বাসের সাথে ইদানিং ব্যবহার করা হয় জীববিজ্ঞানেও। কিন্তু মজার ব্যাপার হল জীববিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা যে ভাবে যুক্তি সাজিয়ে থাকেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা দেন ঠিক উলটো যুক্তি। জীববিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা বলেন আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই অনুপযুক্ত যে প্রাকৃতিক নিয়মে এখানে এমনি এমনি প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে না। আবার জ্যোর্তিবিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার' রা উলটো ভাবে বলেন, এই বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই উপযুক্ত যে এই বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাকৃতিক নিয়মে কোনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। একসাথে দুই বিপরীতধর্মী কথা তো সত্য হতে পারে না। আসলে মাইকেল আইকেদা, বিল জেফ্রিস, ভিক স্টেংগর, রিচার্ড ডকিন্স '৭৩হ অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন এই 'ফাইন টিউনিং' বা 'এনথ্রোপিক' আর্গুমেন্টগুলো সেই পুরোন 'গড ইন গ্যাপস' আর্গুমেন্টেরই নয়া সংস্করণ। যেখানে রহস্য পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা আধুনিক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, সেখানেই ঈশ্বরকে আমদানী করে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হচ্ছে। এভাবে মুক্ত-বুদ্ধি এবং বিজ্ঞান চর্চকে উৎসাহিত না করে বরং অন্ধ বিশ্বাসের কাছে প্রকারন্তরে নতি স্বীকারে আমাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে।

আসলে অনেক বিজ্ঞানীই আজ এই মতের সাথে পুরোপুরি আস্থাশীল যে, মহাবিশ্ব মোটেও আমাদের জন্য 'ফাইন টিউনড' নয়, বরং আমরাই এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে টিকে থাকার সংগ্রামে ধীরে ধীরে নিজেদেরকে 'ফাইন টিউন্ড' করে গড়ে নিয়েছি- 'The universe is not fine-tuned for humanity; Humanity

is fine-tuned to the Universe'। ব্যাপারটা হয়ত মিথ্যে নয়। আমদের চোখের কথাই ধরা যাক। মানুষের চোখ বিবর্তিত হয়েছে এমনভাবে যে, এটি লাল থেকে বেগুনি পর্যন্ত -এই সীমার তড়িচ্চুম্বক বর্ণালিতেই কেবল সংবেদনশীল। এর কারণ হল, আমাদের বায়ুমন্ডল ভেদ করে এই সীমার আলোই বছরের পর বছর ধরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছুচ্ছে। কাজেই সেই অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের চোখও সেভাবেই বিবর্তিত হয়েছে। এখন এই পুরো ব্যাপারটিকে কেউ উলটোওভাবেও ব্যাখ্যা করতে চাইতে পারেন। বলতে পারেন যে, কোন এক বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বা আমাদের চোখকে কে লাল থেকে বেগুনী আলোর সীমায় সংবেদনশীল করে গড়বেন বলেই বায়ুমন্ডলের মাধ্যমে তিনি সেই সীমার মধ্যবর্তী পরিসরের আলো আমাদের চোখে প্রবেশ করতে দেন। তাই আমাদের চোখ এরকম। কিন্তু এভাবে ব্যাখ্যা করাটা কতটা যৌক্তিক? অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেওয়ার মতনই শোনায়। তারপরও 'ফাইন টিউনার'রা ঠিক এভাবেই যুক্তি দিতে পছন্দ করেন। মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলোর মান এরকম কেন, বৈজ্ঞানিকভাবে এটি না খুঁজে এর ব্যাখ্যা হিসেবে 'না হলে পরে পৃথিবীতে প্রাণের আর মানুষের আবির্ভাব ঘটত না' এই ধরণের যুক্তি হাজির করেন। প্রাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মূখ্য হয়, তবে মহাবিস্ফোরনের পর ঈশ্বর কেন ৭০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন এই পৃথিবী তৈরী করতে, আর তারপর আরো ৬০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন 'মানবতার উন্মেষ' ঘটাতে তার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না । পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা আজ জানি, মানুষ তো পুরো সময়ের একশ ভাগের এক ভাগেরও কম সময় ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। তারপরও মানুষকে এত বড় করে তুলে ধরে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন?

আসলে শতাব্দী প্রাচীন 'মানবকেন্দ্রিক' সংস্কারের ভুত মনে হয় কারো কারো মাথা থেকে যাচ্ছেই না। সেই টলেমীর সময় থেকেই আমরা তা দেখে এসেছি। আমাদের এই পৃথিবীটা যে মহাকাশের কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের ভীরে হারিয়ে যাওয়া একটা নিতান্ত সাধারণ গ্রহ মাত্র, -এটি যে কোন কিছুরই কেন্দ্রে নয় - না সৌরজগতের, না এই বিশাল মহাবিশ্বের - এ সত্যটি গ্রহণ করতে মানুষের অনেকটা সময় লেগেছে। পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিলে এর বিশিষ্টতা ক্ষুন্ন হয় এই ভয়েই বোধ হয় টলেমীর 'ভূ-কেন্দ্রিক' মডেল জনমানসে রাজত্ব করেছে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে, আর ধর্ম বিরোধী সত্য উচ্চারণের জন্য কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিওদের সইতে হয়েছে নির্যাতন। একই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা দেখেছি উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৫৯ সাল) যখন চার্লস ডারউইন এবং এ্যলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বিবর্তনের ধারণা সাধারণ মানুষ এখনও 'মন থেকে নিতে পারে নি' কারণ এই তত্ত্ব গ্রহণ করলে 'সৃষ্টির সেরা জীব' মানুষের বিশিষ্টতা ক্ষুন্ন হয়ে যায়! এই সংস্কারের ভুত এক-দু দিনে দূর হবার নয়। তাই রহস্য দেখলেই, জটিলতা দেখলেই মানুষ আজও নিজেকে সৃষ্টির মাঝখানে রেখে, পৃথিবীকে মহাবিশ্বের মাঝখানে বসিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। 'ফাইন-টিউনিং' আর 'অ্যানথ্রোপিক' আর্গুমেন্টগুলো এজন্যই মানুষের কাছে এখনও এত আকর্ষনীয় বলে মনে হয়।

অধিকাংশ বিজ্ঞানীই আজ মনে করেন মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পটি কিছু গোঁড়া খ্রীষ্টানদের ধর্মবিশ্বাস থেকে উদ্ভুত একটি বিশ্বাস-নির্ভর ধারণার চতুর অভিব্যক্তি মাত্র এবং এটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িতও নয় যে এটির সত্যতা কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা কখনও নির্নীত হওয়া সম্ভব। সেজন্যই এটি কখনও বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবী করতে পারে না। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সাফল্যজনক প্রয়োগেই মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য উদঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন, বহু ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হচ্ছেন। এভাবেই ধাপে ধাপে আমরা এগুচ্ছি। তার পরেও এটি অবশ্যই

স্বীকার্য যে, আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতেই এখনও 'ফাঁক' রয়ে গেছে; রয়ে গেছে অনেক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে জটিল কিছু দেখলেই বিজ্ঞান তার পেছনে কোন সৃজনশীল সজ্ঞাত সত্ত্বাকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে এত সহজেই বৈধতা দিয়ে দেবে। সরল সিস্টেম থেকে জটিল সিস্টেমের উন্নয়নের উদাহরণ প্রকৃতিতে খুঁজলেই অনেক পাওয়া যাবে। ঠান্ডায় জলীয়-বাষ্প জমে তুষার কণিকায় পরিণত হওয়া, কিংবা বাতাস আর পানির ঝাপটায় পাথুরে জায়গায় তৈরী হওয়া জটিল নকসার ক্যাথেড্রালের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতেই আছে। যখন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসে বিচিত্র নক্সার হিমবাহ, কিংবা এক পশলা বৃষ্টির পর পশ্চিমাকাশে উদয় হয় বর্ণিল রংধনুর, মুগ্ধ হয় আমাদের অনেকের মন, কিন্তু আমরা কেউ এগুলো তৈরী হওয়ার পেছনে আমরা কেউ সজ্ঞাত সত্ত্বার দাবী করি না। কারণ আমরা সবাই জানি ওগুলো সবই তৈরী হয় কোন সজ্ঞাত সত্ত্বার হস্তক্ষেপ ছাড়াই, পদার্থবিজ্ঞানের কতকগুলো প্রাণহীন নিয়মকে অনুসরণ করে। ক্যালস্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এমিরিটাস অধ্যাপক মার্ক পেরাখ সম্প্রতি 'Unintelligent Design' নামে একটি বই লিখেছেন। বইটিতে তিনি উইলিয়াম ডেম্বস্কি, মাইকেল বিহে আর ফিলিপ জনসন সহ অন্যান্য আই.ডি প্রবক্তাদের সমস্ত যুক্তি খন্ডন করে উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে, আই.ডি কখনই বিজ্ঞান নয়, বরং ছদ্দবেশী ছদ্মবেশী বিজ্ঞান, যাকে ইংরেজীতে আমরা বলি pseudoscience. ডঃ পেরাখ তার বইয়ে নিত্যদিনের বেশ কিছু সাধারণ উদাহরণ হাজির করে দেখিয়েছেন, জটিলতা মানেই বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ নয়, অনর্থক জটিলতা বরং প্রকারন্তরে বুদ্ধিহীনতাই প্রকাশ করে। তাঁর ভাষায়, 'কোন যন্ত্র তা সে মেকানিকালই হোক আর বায়োমেকানিকালই হোক, যদি অতিরিক্ত জটিল হয়, তা বরং বুদ্ধিহীন উৎসের দিকেই নির্দেশ করে' (আনইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন, মার্ক পেরাখ, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১২৬)। কাজেই মহাবিশ্বের কিংবা জীবজগতের জটিলতাকে বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পের প্রমাণ ভাবার কোন যৌক্তিকতা নেই। আর তা ছাড়া জীববিদ্যার ব্যাপারগুলো- যেগুলোকে মাইকেল বিহে বলেছেন 'Irreducible complex', সেগুলো আদপেই সেরকম কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। এযুগের প্রথিতযশাঃ সংশয়বাদী, টেনিজি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মাসিমো পিগ্লিউসি তাঁর 'Design yes, intelligent no: a critique of intelligent design theory and neo-creationism' প্রবন্ধে বলেন, জীবজগতে হয়ত বেশ কিছু উদাহরণ আছে যেগুলোকে জীববিজ্ঞানীরা বিবর্তন তত্ত্বের আলোকে এ মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারছেন না; কারণ জীববিজ্ঞানীদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য নেই। কাজেই এটি মূলতঃ অজ্ঞতা সূচক যুক্তি (Argument from ignorance), কখনই বিহের তথাকথিত Irreducible complexityর প্রমাণ নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উইলিয়াম পিলে যখন প্রথম আঠারো শতকে 'আর্গুমেনট অব ডিজাইন' বা সৃষ্টির অনুকল্পের অবতারণা করেছিলেন, তখন তিনি চোখের গঠন দেখে যার পর নাই বিস্মিত হয়েছিলেন। পিলে ভেবেছিলেন চোখের মত একটি জটিল প্রত্যংগ কোন ভাবেই প্রাকৃতিক উপায়ে বিবর্তিত হতে পারে না। কিন্তু আজকের দিনের জীববিজ্ঞানীরা পর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক নিয়মে চোখের বিবর্তনের ধাপগুলো সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছেন।

আর তাছাড়া আই.ডির বিরুদ্ধে সবচাইতে বড় যুক্তি তো হাতের সামনেই রয়ে গেছে। আমাদের এই 'জটিল' মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে ব্যখার জন্য যদি কোন বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার সত্যই প্রয়োজন হয়, তবে ধরেই নেওয়া যেতে পারে সেই বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বাকে এই মহাবিশ্বের চেয়েও জটিল কিছু হতে হবে। তা হলে সেই জটিল বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করবার জন্য ওই একি যুক্তিতে আবার ততোধিক জটিল কোন সত্ত্বার আমদানী করতে হবে, এমনি ভাবে জটিলতর সত্ত্বার আমদানীর খেলা হয়ত চলতেই থাকবে একের পর এক। এ ধরনের যুক্তি তাই আমাদেরকে অনর্থক অসীমত্বের দিকে ঠেলে দেয়, যা বার্ট্রান্ড রাসেল এবং ডেভিড হিউমের মত দার্শনিকেরা অনেক আগেই অগ্রহনযোগ্য বলে বাতিল করে দিয়েছেন । যতদিন পর্যন্ত

না আই.ডি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যুক্তি আর সংশয়বাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত আই.ডি প্রবক্তাদের ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ছে না বলেই মনে হচ্ছে।

অভিজিৎ রায় পেশায় প্রকৌশলবিদ, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের গবেষক ফেলো, মুক্ত-মনা (*www.mukto-mona.com*)র ফাউনডিং মডারেটর। ইমেইল :*avijit@mukto-mona.com*